হ্যান্ডআউট—অধিবেশন—১.১১

মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সম্প্রসারণের ভূমিকা

শিব্রত নন্দী

ক. সম্প্রসারণ কি?

১. সম্প্রসারণ হচ্ছে একটি দ্বিমূখী যোগাযোগ ব্যবস্থা (Two-way-channel)। দ্বিমুখী যোগাযোগ বলতে বুঝায় গবেষণালব্ধ ও পরীক্ষিত উন্নত কলাকৌশলসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়ে যাওয়া এবং মাঠের সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষনায় নিয়ে আসা। গবেষণালব্ধ সমাধানগুলো আবার মাঠে যাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। এর ফলে মাঠ এবং গবেষণার মধ্যে একটি ধারবাহিক যোগাযোগ গড়ে উঠে। পরীক্ষিত উন্নত বিষয়সমূহ যে বা যারা মাঠে নিয়ে যান–তাদেরকে বলে সম্প্রসারণ কর্মী। মাঠে যে বা যারা বাস্তবে বিষয়টি প্রয়োগ করেন, তারা হতে পারেন একজন কৃষক, মৎস্যজীবি বা অন্যকোন পেশাজীবি।

২. সম্প্রসারণ হচ্ছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Continuous process)। তথ্য সরবরাহ এবং তথ্য গ্রহণের ফলে সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকের মধ্যে একটি বস্তুনিষ্ঠ, গতিময় এবং সৃজনশীল যোগাযোগ গড়ে উঠে।
নতুন এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি পুরাতন পদ্ধতির উপর স্থান করে নেয়। নদীর লক্ষ্য যেমন সব বিপত্তি উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য সমূদ্রের সাথে মিলন তেমনি, সম্প্রসারণের লক্ষ্যও সমস্যাকে সমাধানের লক্ষ্যে সমস্যার মুখোমুখী হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলা। সম্প্রসারণের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষের উন্নয়ন।

৩. সম্প্রসারণ একটি তরঙ্গায়িত প্রক্রিয়া যার কার্যক্রম টেউয়ের মতো নিস্তরঙ্গ পানিতে ছড়িয়ে যায়। সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা এখানে বিচারকের মতো। সাধারণভাবে মাৎস্য সম্প্রসারণকে এভাবেই উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

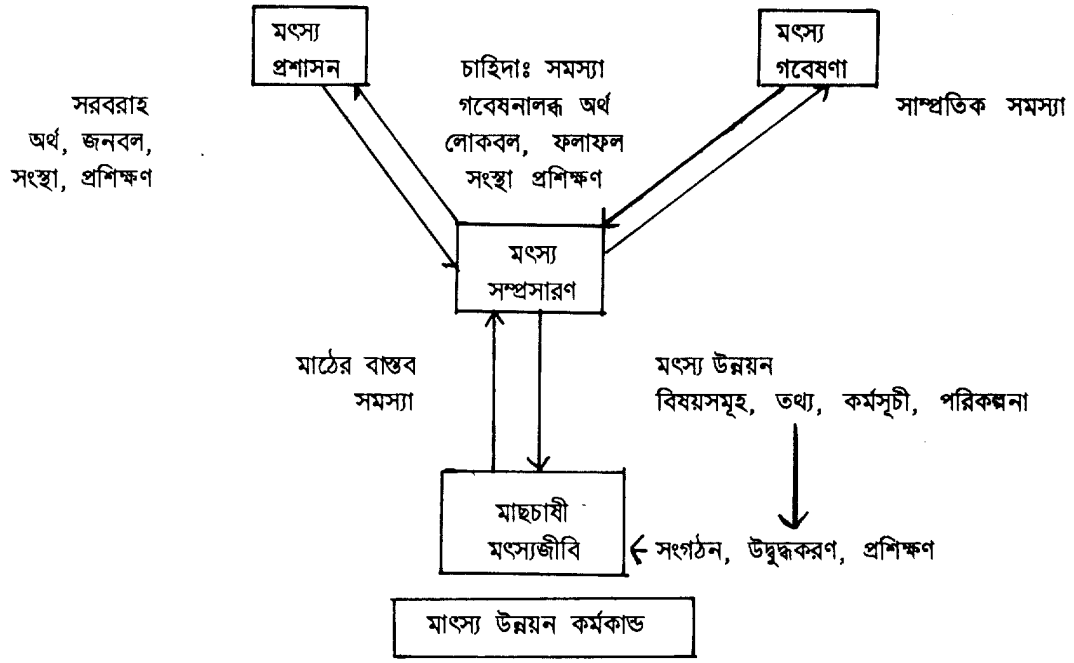

প্রেক্ষিত ঃ মৎস্যজীবি সম্প্রদায়

খ. সম্প্রসারণের মৌলিক উদ্দেশ্যঃ মৎস্যজীবিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মৌলিক উদ্দেশ্য

গ. সম্প্রসারণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ মৎস্যজীবিদের উন্নয়নে সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেঃ

১. মৎস্যজীবিদের চেতনা ও জ্ঞান বৃদ্ধিকরণঃ নিজেদের জীবন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মৎস্যজীবিদের মধ্যে কিছু অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার আছে। জীবন এবং জীবিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে অজস্র সমস্যা। অজ্ঞতা এবং

সমস্যাগুলোকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে চিহ্নিত করে আত্মচেতনা এবং জ্ঞানের মানকে উন্নত করা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অন্যতম দায়িত্ব।

২. আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করাঃ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কার্যক্রম গ্রহণে জেলেদেরকে সহায়তা করতে পারে।

৩. সংগঠন গড়ে তোলাঃ অসংগঠিত অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল এবং মহাজনরা জেলেদের শোষণ করতে প্রয়াসী হয়। এ প্রেক্ষিতে জেলেদের মধ্যে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে সহায়তা করা সম্প্রসারণের অন্যতম কাজ।

৪. পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রয়োগঃ জেলেদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটাতে সহায়তা করা হয় যেমনঃ মাছ ধরার কলাকৌশল, সংরক্ষণ, জাল এবং নৌকা তৈরী ও অন্যান্য।

৫. লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগঃ পেশাগত অবস্থার উন্নয়ন ও আয় বাড়ানোর জন্যে জেলের নিজস্ব উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতির সম্পূরক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ গুরুত্বপুর্ণ।

৬. সম্পদের সমাবেশ ঘটানো এবং পরিপূরক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৭. সেবা সহায়তা ও পরামর্শদানঃ যেমন উপকরণ সংগ্রহ, জাল তৈরী, পেশাগত এবং সাংগঠনিক মান উন্নয়ন, সম্প্রদায়গত উন্নয়ন।

৮. সম্পদপ্রাপ্তির উৎস্যের সাথে মৎস্যজীবিদের যোগাযোগ স্থাপন এবং সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা। যেমনঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক), উপজেলা পরিষদ, উন্নয়মূলক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

৯. পরিচালিত কর্মকান্ডসমূহ নিয়মিত পর্য্যবেক্ষণ, অভিক্ষণ (Monitoring) তত্ত্বাবধান এবং আনুষংগিক সহায়তা প্রদান।

১০. মৎস্যজীবিদের কার্যক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে সম্পৃক্ত করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে তা কাজে লাগানো।

১১. উৎপাদনবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা। যেমন-মাছ আহরণের পাশাপাশি মাছের বংশরক্ষা ও বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, মাছ চাষ, বাড়ীতে মহিলাদের দ্বারা শাকসব্জি ও হাঁসমুরগী পালনে সহায়তা।

১২. বাজারজাতকরণে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ, বাজারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সঠিক মূল্য প্রাপ্তির জন্যে সহায়তা।

১৩. ফলাফল প্রদর্শন ও পদ্ধতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১৪. মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং কাজের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাগুলোকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় সমাধানের জন্যে চেষ্টা করা।

১৫. মাঠের বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণের কার্যকারীতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

১৬. নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন এবং এ যোগাযোগকে মৎস্যজীবিদের উন্নয়নে কাজে লাগানো।

ঘ. সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মৎস্য কর্মকর্তাদের ভূমিকা ঃ

যদিও শুনলে মনে হবে যে, মৎস্য অধিদপ্তরের সেবা ও সহায়তা মৎস্যজীবিদের জন্যে। কিন্তু আসলে তারা যতটুকু সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকেন, তার অধিকাংশই ভোগ করছেন মৎস্য চাষীরা-যারা অধিকাংশই অমৎস্যজীবী। একথা সত্য, এদেশের প্রানীজ আমীষের প্রায় ৮০% ভাগই যোগান দিচ্ছে মাছ। ১৯৭৭-৭৮ সালে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন জলাশয় থেকে মোট উৎপাদন ছিলো ৭৩১,৮১০ মেট্রিক টন এবং সামুদ্রিক উৎপাদন ছিলো ২২০,০০০ টন (উৎসঃ ডানিডা, ১৯৮৮)। এ সময়ে প্রায় ১০ লক্ষ মৎস্যজীবি এ পেশার সাথে যুক্ত ছিলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিরাট মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জন্যে আমরা কতটুকুইবা সেবা সহায়তা পৌছেঁ দিতে পেরেছি? এরা মৎস্যশিকারী। দিনরাত রোদে জলে ভিজে। এদের নেই সুস্থ আশ্রয় স্থল। অপুষ্টি ক্ষুধা আর দারিদ্র তাদের নিত্য সংগী। হাতে-পায়ে তাদের মহাজন আর ফড়িয়ার শোষণের কঠিন শৃঙ্খল। দারিদ্র এদেরকে শৃঙ্খলিত করেছে। আমরা তাদেরকে আরো উৎপাদনশীল এবং কার্যক্ষম না করে তাদেরকে দরিদ্র করেছি। নীতিমালার বাস্তবায়ন নেই-আছে হাহাকার। দারিদ্রের সাথে বাড়ছে জনসংখ্যা, কমছে উৎপাদন। বাড়ছে উপকরণ মূল্য-বাড়ছে না তাদের অর্থনৈতিক প্রাপ্যতা। তারা জানে না আসলে তাদের দেখার জন্যে কারা আছে। এটা আমাদের দুর্বলতা। আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতা অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক। সীমাবদ্ধতা মনের, উদ্যোগের।

একথা সত্য, দেশের মাছ উৎপাদনের মূল উপাদান Open water capture fishery। এতে জড়িত মৎস্যজীবিরা। এদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্যে এদের কাছে সেবা সহায়তা আমাদেরকে পৌছেঁ দিতেই হবে। গত ২০ বছরে দেশে খাদ্য হিসাবে মাদের প্রাপ্তি জনপ্রতি বছরে ১৩ কিলো থেকে নেমে ৮.৩ কিলোতে পৌঁছেছে। এটার মুল কারণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা নয়, সম্পদসমূহকে না জানা এবং সম্পদের ব্যবহারকে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো। সম্প্রসারণ কার্যক্রম এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে

নিশ্চরই সহায়তা করতে পারে। তাই Culture fishery-তে তার কার্যক্রমকে আরো ঘনিষ্ঠ করার সাথে সাথে Capture fishery তেও তাকে অগ্রসর হতেই হবে। এটাই সময়ের দাবী।

প্রেক্ষাপট ঃ পটুয়াখালী–বরগুনা ঃ

১. পানি সম্পদ অবস্থা ঃ

বিষয়	পটুয়াখালী (১)		বরগুনা(২)	
	জলাশয়	উৎপাদন (মেঃ টন)	জলাশয়	উৎপাদন
০ পুকুর সম্পদ				
– সংখ্যা	৫৬,৬৯৫		৩০,৮৩৯	তথ্য সংগ্রহ
– আয়তন (হেক্টর)	৪,২৭৭	৫০৪৭	২,৩২৬	করা যায়নি
০ নদী এবং মোহনা (হেক্টর)	(১০৭,৪৪৩(১+২)	১৬,০০০		ঐ
০ চিংড়ী চাষের উপযুক্ত আধা লবনাক্ত অঞ্চল (হেক্টর)	২০০০	৪		ঐ

তথ্য ঃ মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৮৬

২. মৌলিক সমস্যা ঃ

ক. জলাশয় সম্পর্কিত ঃ

ক–১. **বদ্ধ জলাশয়** ঃ পুকুর, বিল এবং অন্যান্য নীচু জলাশয় এর অন্তর্গত। মৌলিক সমস্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

- ০ মাছ চাষ তেমন একটা হয় না। কেউ কেউ বর্ষাকালে কিছু পোনা ছাড়লেও সার, খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না
- ০ কার্প জাতীয় মাছের পোনা সহজ প্রাপ্য নয়। খুলনা এবং অন্যান্য কিছু এলাকা থেকে কিছু বেপারী পোনা নিয়ে আসে। পোনার মান এবং বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক নয় বলে অনেক চাষীই নিরুৎসাহিত
- ০ গলদা চিংড়ীর পোনা নদীতে পাওয়া গেলেও লালন–পালন করা হয়না। ফলে পুকুরে গলদার বাচ্চা ছাড়া হয় না
- ০ অধিকাংশ জলাই যৌথ মালিকানাধীন। মালিকানার সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে পুকুরের সংস্কারের অভাব। ফলে এটাও মাছ চাষের সমস্যা
- ০ মাছ চাষের জন্যে পুঁজির সংকট।
- ০ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের যথার্থতার অভাব। সম্প্রসারণ কর্মীর স্বল্পতা, উদ্যোগহীনতাও একটি সমস্যা
- ০ খাস পুকুরগুলো যথাযথ বন্দোবস্ত হয়নি। অধিকাংশ পুকুরই হাজামজা। বিল এবং অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়সমূহেরও একই অবস্থা

ক.–২. **মুক্ত জলাশয় ও নদী** ঃ মূলতঃ খাল, জোয়ার ও বন্যা প্লাবিত অঞ্চল এবং নদী নালাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মূল সমস্যাগুলো নিম্নরূপঃ

- ০ নূতন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নে মন্থরগতি
- ০ সম্প্রসারণ কার্যক্রম যথার্থ মৎস্যজীবিদের কাছে না পৌঁছা
- ০ অতিরিক্ত মাছ আহরণ এবং মাছের জীবন ঘনত্ব কমে যাওয়া
- ০ জলাশয়ের জৈব রাসায়নিক অবস্থার অবনতি
- ০ ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ী ধরা এবং ছোট আকারের মাছ ও চিংড়ী আহরণ
- ০ জালের ফাঁস সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে না চলা
- ০ বেড় জালের অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং কিছু কিছু প্রজাতি ধ্বংস

ক–৩. আধা লবনাক্ত অঞ্চল ঃ নদী মোহনার কাছাকাছি নদী অঞ্চল, জোয়ার প্লাবিত ধানক্ষেত, বেরি বাঁধ এলাকা এর অন্তর্গত। এর মূল সমস্যাসমূহের ধরণ মুলতঃ মুক্ত জলাশয়ের অনুরূপ।

ক–৪. গভীর সমুদ্র ঃ গভীর সমুদ্র এলাকার সমস্যার মুল চরিত্র মুক্ত জলাশয়ের অনুরূপ।

খ. মৎস্যজীবি সম্প্রদায় ঃ বদ্ধ জলাশয় এবং অন্যান্য জলাশয়ে মাছ আহরণের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবি সম্প্রদায়। মূলতঃ হিলসা ফিসারী এবং চিংড়ী ফিসারীর মুল কর্মকান্ড তারাই পরিচালনা করে থাকে। এদের আহরিত মাছই বাংলাদেশের মৌলিক আভ্যন্তরীন চাহিদা এবং বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের মূল নিয়ামক। এই মৎস্যজীবিদের মুল সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

- নিজস্ব নৌকা এবং জালের অভাব। কিছু কিছু দেশী নৌকা থাকলেও যান্ত্রিক নৌকার মালিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষণকারী মহাজন
- পুঁজির সংকট, ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে এক করুণ শোষণ–মুলক অবস্থায় অবস্থান
- উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব। পুরো বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই উৎপাদনের প্রকৃত মুল্যের প্রায় ৪০ % পায় জেলে এবং বাকী ৬০% মধ্যস্বত্বভোগী
- শিক্ষা এবং সংগঠনের অভাব
- চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাব
- সম্প্রসারণ সেবা পায়না। ফলে প্রচলিত আইন–কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা
- মৎস্য শিকারের বাইরেও নতুন কিছু উদ্যোগ গ্রহণের অভাব

৩. সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য উন্নয়ন ক্ষেত্র ঃ

ক. বদ্ধ জলাশয়ে চিংড়ী ও কার্প মিশ্রচাষ ঃ এর ফলে জলাশয়গুলোর সার্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়বে। কর্ম সংস্থান বাড়বে এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। মানুষের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির স্থলে অর্ধ–নিবীড় পদ্ধতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে হেকটর প্রতি বছরে ২৪০০ কিলো মাছ এবং ২৫০ কিলো চিংড়ী উৎপাদন সম্ভব।

সম্ভাব্য কর্মকান্ড ঃ

- সম্প্রসারণ সেবা বাড়ানোর মাধ্যমে
- হ্যাচারী নির্মাণ, পোনা লালন–পালন, পুকুর প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর
- বসত বাড়ীর হাজামজা পুকুরকে চাষাবাদে নিয়ে আসা, পারিবারিক খামার প্রতিষ্ঠা ও আত্ম–নির্ভরশীল উদ্যোগ গ্রহণ
- গলদা চিংড়ীর পোনা সংগ্রহ, লালন–পালন এবং একক ও মিশ্র চাষে প্রযুক্তি হস্তান্তর
- বড় পুকুর ও জলাশয়গুলোকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় পুনঃখনন এবং মাছ চাষ
- খাস পুকুর, জলাশয়গুলোকে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মধ্যে বন্টণ এবং সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে চাষাবাদ
- বড় জলাশয়গুলোর যথাযথ উন্নয়ন করে মৎস্যজীবিদের মধ্যে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা। পোনা সরবরাহ, মজুদ এবং ব্যবস্থাপনা। ঋণদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান

খ. নদী এবং মুক্ত জলাশয় ঃ পটুয়াখালী এবং বরগুনা এলাকায় প্রায় ১৮,০০০ মৎসজীবি নদী এবং সাগরে মৎস্য আহরণে জড়িত। এদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সম্প্রসারণ কর্মীদের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভাব্য কর্মকান্ড ঃ

- নৌকা এবং জালের ব্যবস্থা
- সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- আহরণ অঞ্চলে ন্যায্যমূল্যে যথেষ্ট বরফ সরবরাহের নিশ্চয়তা
- মৎস্যজীবি গ্রামগুলোর উন্নয়নঃ ব্যবহারিক শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা, সম্পদের ব্যবহার, আত্ম উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

গ. আধা লবণাক্ত অঞ্চল ঃ চট্টগ্রাম, খুলনা, সাতক্ষীরার মতো এ অঞ্চলে ঘেরে মাছ ও চিংড়ী কার্যক্রম তেমন নাই বললেই চলে। চিংড়ী চাষে এখানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম ঃ

- পানি উন্নয়ন বোর্ডের পোল্ডার অঞ্চলের ভেতর চিংড়ী খামার প্রতিষ্ঠার সহায়তা
- চিংড়ী চাষে উৎসাহ প্রদান
- চিংড়ী পোনা সংগ্রহে ও লালনে জেলেদের কারিগরি সহায়তা প্রদান

ঘ. গভীর সমুদ্র ঃ চিংড়ী এবং ইলিশ মাছের এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রের উন্নয়ন মৎস্যজীবিদের উন্নয়নের সাথে জড়িত।

সম্ভাব্য কার্যক্রম ঃ

- মৎস্যজীবিদের যান্ত্রিক নৌকা এবং জাল প্রাপ্তির জন্যে সহায়তা
- বরফ সরবরাহে নিশ্চয়তা এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা
- শক্তিশালী মৎস্যজীবি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং এর মাধ্যমে সরকারী উন্নয়ন কার্যকম বাস্তবায়ন

৪. মৎস্য কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড ঃ

জলমহালের উন্নয়ন যেমন মৎস্যজীবিদের উন্নয়নের পথে অন্যতম চালিকাশক্তি তেমনি মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নও জলমহাল এবং পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের চাবিকাঠি। ত্রি বর্গীয় 'জ' যেমন জল, জাল, জেলে এর সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন কঠিন। সমস্যা অনেক। সরকারের আছে সীমাবদ্ধতা। আছে সম্পদের স্বল্পতা। এসবের ভেতরেও আমরা অবশ্যই জেলেদের এবং মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে একজন সম্প্রসারণ কর্মী হিসাবে অনেক কাজই করতে পারি। সম্পদ মূল সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে উদ্যোগের। এ উদ্যোগ চিন্তাজগতের, কর্মের। প্রয়োজন নিজ পেশাকে গভীরভাবে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। প্রয়োজন মৎস্যজীবিদের প্রতি মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা। ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠা হয় নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানুষকে উদ্যোগী করে তোলে। এ উদ্যোগ দুই স্তরে। একঃ পানি সম্পদের উন্নয়ন সমাবেশ, দুইঃ জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এ দুটি পারস্পরিক নির্ভরশীল। আমাদের উদ্যোগ হতে পারেঃ

- জেলেদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা, সঞ্চয় গড়ে তুলতে সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান
- জেলেদের নিজস্ব সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়তা
- জেলে পরিবারের মহিলাদের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণে পরামর্শ প্রদান, যেমন-জালবুনা, বেতের কাজ, শাক-সব্জি চাষ এবং হাসমুরগী পালন কর্মসূচী
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসচীতে পুকুর জলার উন্নয়ন এবং মাছ চাষের উদ্যোগ
- পারিবারিক মৎস্য খামার, শাক-শব্জি ও হাস-মুরগী খামার পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণ। এ বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- সহজভাবে ঋণ পেতে জেলে সম্প্রদায় যাতে সমর্থ হয়, সেজন্যে স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান। একই সময়ে মৎস্য উন্নয়ন সংস্থাকে আরো কর্মক্ষম করে তুলতে পরামর্শ প্রদান
- স্থানীয় এবং জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার সাথে মৎস্যজীবি সংগঠনের যোগাযোগ স্থাপনে সহয়তা। এর ফলে তারা Community Development সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণে সহায়তা এবং সেবা পেতে পারে
- উপজেলা পরিষদের সাথে মৎস্যজীবি সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা যাতে খাস পুকুর ও জলাসমুহ তারা লীজ পেতে পারে।
- জেলা এবং উপজেলা পরিষদের সহায়তায় অথবা উৎসাহী অন্যকোন সংস্থার সহায়তায় মৎস্যজীবিদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন। এতে সরকারের জলমহাল নীতিমালা, মৎস্য আইন এবং অন্যান্য আইনগত বিষয়সমূহ অবহিত করা। এর ফলে মৎস্যজীবিদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।
- নতুন জলমহাল নীতিমালায় তাদের লাইসেন্স প্রদান এবং সঠিক কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা
- সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মূল ধারার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা এবং সম্ভাব্য সুযোগসমুহ যাতে জেলেরা পেতে পারে তার প্রচেষ্টা

মৎস্যজীবিদের জীবন, জীবিকা, তাদের প্রচলিত বিশ্বাস, তাদের চেতনা সর্বোপরি তাদের বাস্তব অবস্থার সাথে নিজেকে ভালোভাবে পরিচিত না করে কোন গভীর উন্নয়ন ধারায় তাদেরকে টেনে আনা কঠিন। একজন সম্প্রসারণ কর্মী প্রকারান্তরে একজন উন্নয়ন কর্মী। এই মানুষই স্রষ্টার শ্রেষ্ট সৃষ্টি। মানুষ চাইলে অসাধ্য সাধন দুরূহ কিছুই না।

"কি আছে পৃথিবীতে অসাধ্য
যদি থাকে উচ্চতা পরিমাপের দুর্জয় সাহস"

হ্যান্ডআউট–অধিবেশন ১.১৪

কার্যকরী যোগাযোগ (Effective Communication) *

প্রত্যক্ষ (সার্থক) যোগাযোগের ব্যাপারটাই হলো বক্তা ও শ্রোতার সমঝোতার ক্ষেত্রে একটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

যোগাযোগ সার্থক এবং ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা তা দেখতে হলে নিম্নে লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে তাকে বিচার করতে হবেঃ

১. দ্বি–মুখী যোগাযোগঃ একপক্ষের মতামত, ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও অনুভূতির সাথে অন্য পক্ষের খোলাখুলি ভাব বিনিময় হওয়াই দ্বি–মুখী যোগাযোগ।

২. শ্রবণে সক্রিয়তাঃ আলোচনা তখনই সার্থক বলে ধরা হবে যখন শ্রোতা বক্তার বক্তব্য মনোযোগের সাথে শুনে বক্তব্যের বিষয়বস্তু, ভাব ও অর্থ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে গ্রহণ করে।

৩. ফিড–ব্যাকঃ আলোচনায় শ্রোতার শারীরিক উপস্থিতিই যথেষ্ট নয় বরং শ্রোতা অন্যের বক্তব্যের উপর নিজের মতামতও ব্যক্ত করে। 'ফিড ব্যাক' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বক্তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ও শ্রোতার শ্রুত বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা ধরা পড়ে।

৪. স্বতঃস্ফূর্ততাঃ বক্তব্য বিষয় চাপিয়ে দিলে শ্রোতাকে শুধু ভারাক্রান্তই করা হয়। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বিষয়বস্তুগতভাবে স্বতঃস্ফূর্ততা আদান–প্রদান যদি না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে যোগাযোগ সার্থক হচ্ছে না।

৫. সরাসরি উপস্থাপনাঃ মূল বক্তব্য তা সে মৌখিক, অমৌখিক অথবা সাংকেতিক, যে ভাবেই হোক না কেন তাতে যদি মিশ্র ও পরস্পর–বিরোধী বিষয়বস্তুর সমাবেশ হয় তা হলে পুরো ব্যাপারটাই এলোমেলো হয়ে পড়ে। তাই সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপনা সার্থক–যোগাযোগের একটি প্রধান শর্ত।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে কোন সার্থক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দু'টো দিক রয়েছে; (এক) বিষয়বস্তুগত ও (দুই) সম্পর্কগত। আলোচনার সময় আমরা বক্তার বক্তব্যই শুধু শুনি না, সেই সাথে আমরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিধিও লক্ষ্য করে থাকি। আর আমরা যদি সম্পর্কের সূত্রগুলো নিয়েই ভাবতে থাকি তাহলে কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তুগত ভাবের খেই হারিয়ে ফেলি। তাই পরিশেষে বলা যায় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তখনই সার্থক হয় যখন বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুগত ও সম্পর্কগত উভয় দিকই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়।

যোগাযোগ পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পাঁচটি প্রধান কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হচ্ছে মুখোমুখি কথাবার্তা বলা। কোন প্রশ্ন না করেও সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে অপরের মুখোমুখী হবার কৌশল আমরা সবাই শিখতে পারি। স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেও আমরা অনেক ফালতু প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি।

সক্রিয় শ্রবণ উৎসাহিত করা উচিৎ কেননা এটা পরোক্ষ যোগাযোগের একমাত্র প্রতিষেধক। সক্রিয় শ্রবণ পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে আমরা যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করি এবং এর মাধ্যমেই তার সরাসরি প্রকাশ ও তার বিন্যাসকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে কি–না তা যাচাই করার সুযোগ পাই।

প্রত্যেক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় সুষ্ঠু মাধ্যম হলো বক্তার সক্রিয় বা নিজের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বক্তার মনে যদি পরিষ্কার ধারণা থাকে এবং বক্তা যদি পরিসংখ্যান, দায়িত্ব, গুরুত্ব ও সঠিক অনুভূতি দিয়ে তা অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে তবেই যোগাযোগ সার্থক হয়ে উঠে। আমরা কি ভাবছি, আমাদের কি আছে এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা কারা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকাই ফলপ্রসূ যোগাযোগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রত্যক্ষ যোগাযোগের চতুর্থ মাধ্যম হলো প্রশ্নাবলীর পূর্বাপর অবস্থান নিরূপণ করা। অনেক প্রশ্নেরই অবস্থান জানা না থাকার ফলে আমরা জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকি, অথচ এরকমটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যোগাযোগ প্রশ্নের মুখোমুখী হবার সময় তার উৎস সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থেকে পুর্ণ পরিস্থিতির একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা দেওয়া উচিৎ।

ফলপ্রসূ ও সার্থক যোগাযোগের শেষ এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো পারস্পরিক বিনিময়। যে কোন ধরণের যোগাযোগই হলো একটা বিনিময় প্রক্রিয়া, কেননা যোগাযোগ করতে হলেই আমরা পরস্পরের মতামত, বিশ্বাস, চিন্তা–ভাবনা, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য, সজ্ঞা, চাহিদা, স্বার্থ, সিদ্ধান্ত, দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে ভাব বিনিময় করে থাকি। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উল্লেখিত যে কোন পদ্ধতিকে কার্যকর করতে হলে অন্যদের সাথে সমমানসিকতা পোষণ করার কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হবে। এই ঝুঁকিটুকু নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যদি আমরা প্রস্তুত না থাকি তবে প্রত্যক্ষ ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নয়।

---

* John E. Jones and William Pfeiffer-Annual Handbook for Group Facilitators. Universities Inc, USA, 1979.